অর্থনৈতিক উন্নয়নে নেতৃত্ব ও গণ-উদ্যোগের ভূমিকা

মোহাম্মদ আনিসুর রহমান

১। তত্ত্ব

১.১ অর্থনৈতিক উন্নতির কোন বাঁধাধরা পরিমাণগত সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। বাজার-দর -ভিত্তিক জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার দ্বারা অনেকে অর্থনৈতিক উন্নতির পরিমাণ করে থাকেন। যেহেতু বাজার-দর জাতীয় আয়ের বন্টন ব্যবস্থার প্রতিফলন, সেইহেতু এই বন্টন ব্যবস্থাকে নীতিগতভাবে স্বীকার না করলে এই ভাবে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির পরিমাপ করা শাস্ত্র সম্মত নয় এ কথা বহুকাল আগেই প্রমাণ করা হয়েছে[১]। বাজার দরের পরিবর্তে "ছায়া মূল্য" দ্বারা[২] জাতীয় আয়ের হিসাব এবং সেই আয়ের বৃদ্ধি থেকে অর্থনৈতিক উন্নতির পরিমাপ করাবার প্রস্তাব শাস্ত্রে রয়েছে, কিন্তু সামগ্রিক সামাজিক কল্যাণের একটা পরিমাপ না পেলে 'ছায়ামূল্য'কেই পাওয়া যায় না, এবং সামাজিক কল্যাণের পরিমাপ পেলে সরাসরি তার থেকেই অর্থনৈতিক উন্নতির পরিমাপও পাওয়া যাবে কাজেই ছায়ামূল্যের আর প্রয়োজন হবে না। এতে মূলত: একই প্রশ্ন ভিক্ষা করা হয়, কারণ সামাজিক কল্যাণেরও কোন বাঁধাধরা পরিমাণগত সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়।

১.২। সামাজিক কল্যাণের সংজ্ঞা, এবং অতএব অর্থনৈতিক উন্নতির সংজ্ঞা চূড়ান্তভাবে কেবলমাত্র সামাজিক মঞ্চেই নিরূপিত হতে পারে। গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টা স্বাভাবত:ই এইরূপ একটি মঞ্চ সৃষ্টি করে। গণ-উদ্যোগের লক্ষ্য গণস্বার্থ অর্থাৎ গণকল্যাণ, যে গণস্বার্থের সংজ্ঞা গণ–উদ্যোগের গতিশীলতার মধ্য দিয়েই নিরূপিত হয় এবং এই সংজ্ঞা অনুযায়ী ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত কাজের মূল্যায়ণও গণমঞ্চেই সাধিত হয়। অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে গণউদ্যোগের তাই সরাসরি সংজ্ঞাগত সম্পর্কই রয়েছে।

১.৩। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে গণ-উদ্যোগের ভূমিকা নীতিগতভাবেও সুস্পষ্ট কারণ মানুষের সম্মিলিত শ্রমের সৃজনশীল বিকাশই সমাজতন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশ সামাজতান্ত্রিক দেশ না হলেও সমাজতন্ত্র জাতীয় লক্ষ্য এ কথা যদি ধরে নেওয়া যায় তাহলে গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দাবী করে।

এছাড়া বাংলাদেশে জনশক্তিই মূল্য অর্থনৈতিক সম্পদ এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক সম্পদ অপেক্ষাকৃত সীমিত; এ অবস্থায় দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য গণ-উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী।

১.৪। শ্রেণীবিহীন পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক দেশে গণ-উদ্যোগ স্বতঃস্ফূর্ত হবে। তবে বিভিন্ন কারণে পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক পর্য্যায়ে পৌছবার আগে নেতৃত্বাধীন গণ-উদ্যোগের প্রয়োজন হতে পারে।

১.৫। সমাজ ব্যবস্থা দীর্ঘদিন মানুষকে পরমুখাপেক্ষী করে রাখলে এর থেকে নিজের উদ্যোগ ফিরে পাওয়া সহজ নয়। স্বত:স্ফূর্ত গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে এই উদ্যোগ ছিনিয়ে নেয়া অর্থাৎ সমাজব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব হোতে পারে, কিন্তু তা সময়-সাপেক্ষ। এই ভাবে সমাজ পরিবর্তন আজো কোন দেশে হয় নাই। যে সব দেশে বৈপ্লবিক সমাজ পরিবর্তন হয়েছে সে-সমস্ত দেশেই পরিচালিত গন-আন্দোলনের মাধ্যমেই এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এর প্রধান কারন সমাজ পরিবর্তনের কার্যকরী চেতনা আপামর শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে আসবার আগেই কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যে এসে যায় এবং নিজেদের ভেতরকার তাগিদেই তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই পথে গন-আন্দোলন সৃষ্টি ও তাতে নেতৃত্ব দিতে অবতীর্ন হন। এক দেশে এই ভাবে পরিচালিত গন-সংগ্রামের ফলে সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসলে অন্যান্য দেশের চিন্তাশীল মহলেও তার ঢেউ এসে পড়ে, এবং এই ঢেউ এর গতিশীলতা সেই সব দেশেও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিপ্লবী চেতনা ও প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবার আগেই সমাজ পরিবর্তনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

১.৬ এই ভাবে সমাজ পরিবর্তন দেশে দেশে হবে এবং নেতৃত্বের আন্তরীকতা সাপেক্ষে বিশ্বের প্রগতিশীল মহলে অভিনন্দিত হবে। কিন্তু তাতে সমাজ পরিবর্তনের সূচনাতেই গন চেতনা সম্পূর্ণ থাকবে না, গনস্বার্থ ও ব্যক্তি স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব থেকে যাবে, এবং আপামর জনসাধারন কমবেশী “সরকার মুখী” বা “নেতা মুখী” থেকে যাবে। এই অবস্থায় অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য স্বতস্ফূর্ত গন উদ্যোগের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম থাকবে। এবং তা এখানে ওখানে হলেও ব্যাক্তিস্বার্থ ও গনস্বার্থের দ্বন্দ্বে, এবং সেই দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রতিবিপ্লীবদের তৎপরতায়, সে উদ্যোগ বিপথে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে গন উদ্যোগ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বাধীন হওয়া প্রয়োজন হবে।

১.৭ সমাজ পরিবর্তনের এইরূপ পর্যায়ে নেতৃত্বের ওপর অতি সুকঠিন দায়িত্ব এসে পড়ে। সমাজের অগ্রগতির ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য জনসাধারনকে প্রস্তুত করে গন-আন্দোলন পরিচালিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তের মোকাবিলা করাই শুধু নয়, জনসাধারনকে স্বতস্ফূর্ত গনউদ্যোগের জন্য মানসিক, শিক্ষাগত ও সাংগঠনিক দিক দিয়ে প্রস্তুত করাও নেতৃত্বের গুরত্বপূর্ণ দায়িত্ব হয়ে ওঠে। নেতৃবর্গ নিজেরা যতোই আন্তরীক, গন-হিতাকাঙ্খী, এবং যতোই পারদর্শী হন না কেনো, যতদিন জনসাধারন নিজেদের কল্যানের জন্য তাদের

নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল থাকবেন ততোদিন সমাজ ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ থেকে যাবে এই জন্য-যে নেতৃবর্গের আন্তরিকতা ও দক্ষতার উপরই গন-আন্দোলন নির্ভর কোরবে, এবং জনসাধারন মূলত; পরমুখাপেক্ষী থেকে যাবেন। সত্যিকারের দীর্ঘমেয়াদী গনস্বার্থ তাই নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী কোন সমাজ ব্যবস্থাতেই সংরক্ষিত হোতে পারেনা, এবং গনকল্যাণে আত্মনিয়োজিত নেতৃত্বের সত্যিকার পরীক্ষা সমাজ ও অর্থনীতির অগ্রগতির জন্য জনসাধারনের তাদেরই, এবং তাদের পরবর্তীকালে অন্য যে কোন নেতৃবর্গের, নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে এনে ক্রমশ: তা বিলীন কোরে দিতে তারা সচেষ্ট কিনা তারই উপর।

১.৮ উপরোক্ত মতবাদ কেন্দ্রীয় সংগঠনের পরিপন্থী নয় । সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ভারসম্য রাখবার জন্য, এবং সম্পদের অপচয় না করে সুপরিকল্পিত অগ্রগতির জন্য, কেন্দ্রিয় সংগঠনের প্রয়োজন সর্বকালেই থাকবে। সব সামাজিক সমস্যার স্থানীয় সমস্যা (স্থানীয় গন-উদ্যোগে) সম্ভব নয়। অনেক সমস্যারই একটি জাতীয় (এমনকি, আন্তর্জাতীয়) আয়তন রয়েছে যার চরিত্রের সঠিক উপলব্ধি স্থানীয় পরিবেশে এবং স্থানীয় মঞ্চ থেকে করা দুরহ। তত্ত্বগতভাবে অর্থনীতিতে আংশিক ও সাধারন ভারসম্যের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, জাতীয় সমস্যার স্থানীয় সমাধানের মধ্যেকার দ্বন্দ্বও সেইরূপ। ইকনমি অব স্কেল অথবা কোঅর্ডিনেশান এর জন্যও অনেক উন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সংগঠনাধীন হওয়া বাঞ্ছনীয় হবে। এরূপ কেন্দ্রীয় সংগঠনের উপর নির্ভরশীলতা গন-উদ্যোগের পরিপন্থী নয় যদি কেন্দ্রীয় সংগঠন গনশক্তির কাছে দায়িত্বশীল থাকে, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সংগঠনের কর্মকর্তারা সত্যিকার অর্থে জনসাধারনের নেতৃত্ব নয়, প্রতিনিধিত্ব করেন। সত্যিকার গনতন্ত্রের অর্থও এই, এবং সমাজতন্ত্রের তত্ত্বে পরিকল্পিত সমাজ ও অর্থনীতি উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের ক্রমশ: বিলোপের উল্লেখও এই ব্যবস্থারই ইঙ্গিত করে।

২। কয়েকটি বাস্তব অভিজ্ঞতা

২.১ জনসাধারনের সার্বভৌমত্ব সর্বান্ত:করনে স্বীকার করে সমাজ ও অর্থনীতি পরিচালনার জন্য জনসাধারনকে প্রস্তুত করে নিঃস্বার্থভাবে তাদের হাতে ক্ষমতা ও উদ্যোগ হস্তান্তর করা যে কোন নেতৃত্বের পক্ষেই অত্যন্ত সুকঠিন কাজ। সমাজের স্বার্থের মধ্যে নিজের ব্যক্তিস্বার্থকে এবং অহংকে সম্পূর্ণভাবে বিলীন করে দেওয়া সমাজতান্ত্রিক আদর্শের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। কিন্তু ইতিহাসে এরূপ ত্যাগের আদর্শ বিরল।

২.১ ১৯৪৮ সালে চীনের মুক্ত এলাকায় কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে ভূমি সংস্কার আন্দোলনের এক পর্য্যায়ে বিভিন্ন গ্রামে পাটির প্রতিটি সদস্যকে কৃষকদের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় ভূমি

সংস্কারে নেতৃত্ব দিতে যেয়ে সদস্যবৃন্দ যে সমস্ত অন্যায় করেন তার বিচারের জন্য, এবং তাদের পার্টির সদস্যপদে বহাল থাকবার যোগ্যতা নিরূপন করবার জন্য। উইলিয়াম হিল্টনের *ফানসেন* নামক গ্রন্থে একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে এর বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। নেতৃত্ব ও গন-উদ্যোগের যে তত্ত্ব উপরে আলোচিত হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনাটি বিস্তারিত বিশ্লেষণের যোগ্যতা রাখে। পার্টির সদস্যদের এই গনবিচারের উদ্দেশ্য শুধু তাদের অন্যায়ের প্রতিকারই ছিলনা, বরঞ্চ এটি অপেক্ষাকৃত গৌণ উদ্দেশ্যই ছিল। এই আন্দোলনের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল গতানুগতিকভাবে উপর থেকে আসা শাসন ও নেতৃত্ব-মুখী কৃষক সম্প্রদায়কে তাদের সার্বভৌমত্ব বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দয়ে উপলব্ধি করানো, এবং এই ভাবে তাদের বহু শতাব্দির একটি 'এলিয়েনেশন' থেকে মুক্ত করে তাদের মধ্যে স্বত:স্ফুর্ত গন-উদ্যোগের সঞ্চার করা। এই আন্দোলনের সম্পূর্ণ মূল্যায়ন আরো তথ্য-সাপেক্ষ, কিন্তু স্বত:স্ফূর্ত গন-উদ্যোগ সঞ্চারের এবং কেন্দ্রীয় সংগঠনের সদস্যদের সম্পূর্ণরূপে গন-সার্বভৌমত্বের কাছে নতি স্বীকার করাবার পদ্ধতি হিসাবে এটি অভিনবত্ব দাবী কোরতে পারে। পরবর্তীকালে চীনে সংগঠিত "সাংস্কৃতিক বিপ্লব" এর আদর্শগত ভিত্তিও এই আন্দোলনের মধ্যে পাওয়া যায়।

২.৩উত্তর ভিয়েতনামের ভূমি সংস্কারের অভিজ্ঞতাও এই প্রসঙ্গে উল্যেখযোগ্য[৩]। ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে ভূমি সংস্কারের কর্মসূচী সরকারীভাবে ঘোষনা করা হয় এবং এর প্রথম পর্যায়ে ভূমি সংস্কার আন্দোলনের জন্য কৃষকদের সংহত ও সম্মিলিত করবার পদ্ধতি হিসেবে কেন্দ্রীয় পার্টির কর্মীদের "একত্রে তিনকর্ম" (থ্রি টুগেদার) ব্রত নিতে নির্দেশ দেওয়া হয় - কৃষকদের সঙ্গে একত্রে বাস, একত্রে আহার এবং একত্রে কাজ করা। ভূমি সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নে এখানেও কিছু কিছূ পার্টির সদস্য ক্ষমতার অপব্যবহার করেন এবং তাদের অনেককে গন-আদালতের সম্মূখীন করা হয় শুধু তাদের শাস্তির জন্যই নয়, "কালেক্টিভ ইমোশনাল শক" দিয়ে দিয়ে নেতৃত্ব সম্বন্ধে সনাতন প্রতিক্রিয়াশীল গন-সংস্কার দুর করবার প্রচেষ্ঠা হিসেবেও। পরবর্তী পর্য্যায়ে (১৯৫৯ সাল থেকে) একক মালিকানা উঠিয়ে দিয়ে যৌথমালিকানার পথে অগ্রসর হবার জন্য যে কর্মসূচী নেওয়া হয় তা প্রথম দিকে মূলত: ওপর থেকে আমলাতান্ত্রিক যন্ত্র দ্বারাই পরিচালিত ছিল যার ফলে এই কর্মসূচী কৃষকদের স্বত:স্ফূর্ত সমর্থন সব স্থানে পায় নাই, এবং যৌথ মালিকানাধীন জমিতে কৃষি উৎপাদন সর্বত্র আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। এই ত্রুটি শোধরাবার জন্য ১৯৬৭ সালে তিনমাস ব্যাপী এক আন্দোলনে পার্টির আমলাতান্ত্রিক চরিত্র সংশোধন করার চেষ্টা করা হয় এবং কৃষক সংগঠনগুলোর হাতে অনেকখানি ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। এর ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এবং উৎপাদন থেকে উদ্বৃত বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শুভ হয়েছে বলে শোনা যায়।

২.৪ কোন কোন "সমাজতান্ত্রিক" দেশে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এবং আমলাতন্ত্রের হাতে অত্যধিক ক্ষমতা ন্যস্ত আছে এবং এর ফলে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী গন-উদ্যোগের যথাযথ বিকাশ হতে পারছেনা বলে অভিযোগ রয়েছে। কিউবাতে আমলাতান্ত্রিক (অর্থ্যৎ ওপরের কাছে দায়িত্বশীল) শাসন ব্যবস্থা এখনো বিদ্যমান থাকলেও[৪] নেতৃবর্গের মধ্যে আভিজাত্য মনোভাব অনেকাংশে দূর হয়েছে এবং শুধু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নন, সরকারী কর্মচারী, বুদ্ধিজীবি প্রমুখ সকলেই সাধারন মানুষের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে দেশ গড়ার কাজে নেমেছেন। উদাহরন স্বরূপ শোনা যায় কিউবাতে শ্রমিকসংঘ কিছু কিছু শ্রমভারী প্রকল্প প্রনয়ণ করেন, যেমন রাস্তা নির্মাণ, গুদামঘর, গন আবাস ইত্যাদি নির্মাণ, এবং সে সব প্রকল্পের জন্য স্বেচ্ছাশ্রম আহবান করেন। এই আহবানে সরকারী কর্মচারী, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রভৃতি অভিজাত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ নাগরিক শ্রমিক সংঘের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাশ্রম দিতে নেমে যান। শোনা যায় সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনই সপ্তাহে একদিন করে এই ভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে থাকেন।

২.৫ বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বর্তমানে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের বহুবিধ ব্যর্থতার মধ্যে তাদের আভিজাত্য-মনোভাব একটি, যার ফলে এই উন্নয়নের জন্য কোন প্রকার গন উদ্যেগ সঞ্চার করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই আভিজাত্য মনোভাবের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ১৯৭৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরে ঠাকুরগাঁয়ে আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস পালনের সময়। জাতীয় এই অনুষ্ঠানটি প্রথমে কুমিল্লা একাডেমীতে পালনের বন্দোবস্ত হয়েছিল, কিন্তু আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে জানা যায় যে, ঠাকুরগাঁয়ে কচুবাড়ী-কৃষ্টপুর গ্রামের তরুন যুবকরা এক আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের গ্রাম থেকে টিপসই সম্পূর্ণ তুলে দিয়েছেন। এই অভিনব সংবাদ পাবার পর কয়েকজন উদ্যোগী নাগরিকের প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবসের অনুষ্ঠানটি ঠাকুরগাঁতে স্থানান্তরিত করা হয় দেশের প্রথম টিপসই-মুক্ত গ্রামটিকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। সেই গ্রামের উদ্যোগী যুবকরা এতে উৎসাহী হয়ে গ্রামের সকলের স্বেচ্ছাশ্রম সাম্মিলিত করে গ্রামটি তিন সাপ্তাহ ধরে পরিষ্কার করেন এবং শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত মটরে করে যাবার রাস্তা মেরামত করেন। অনুষ্ঠানটি দুইদিনব্যপী ঠাকুরগাঁ শহরেই মহা জাঁকজমকের সঙ্গে হয় এবং তৎকালীন রাষ্ট্রপতি, একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বহু উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, বুদ্ধিজীবি প্রমুখ অভিজাত ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানটি ভূষিত করেন। কিন্তু শহর থেকে মাত্র ছয় মাইল দুরে কচুবাড়ী-কৃষ্টপুর গ্রামে কেউই যান নাই। সেই গ্রামের উদ্যোগী যুবকরা বিমানবন্দরে যান রাষ্ট্রপতিকে তাদের গ্রামে নিয়ে যাবার জন্য কিন্তু নিরাশ হয়ে গ্রামে ফিরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। দেশের অভিজাত শ্রেণী, রাজনৈতিক, আমলাতান্ত্রিক এবং বুদ্ধিজীবি গোষ্ঠি এই ভাবে একটি গ্রামের স্বাক্ষরতা আন্দোলনের অভিনব উদ্যোগের প্রতি যে

অসম্মান প্রদর্শন করেছেন তা তাদের শ্রেণীগতভাবে গ্রাম বিমুখতা এবং দরিদ্র গ্রামবাসীদের প্রতি অবজ্ঞার একটি উদাহরণ মাত্র। গ্রাম বাংলায় গন-উদ্যোগের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে এরূপ অভিজাত নেতৃত্ব কখনোই কল্যাণকর হোতে পারে না।

---

[১] জেম্স্ মারলিস "দি ইভ্যালুয়েশন অব ন্যাশনাল ইনকাম, ইন এ্যান ইমপারফেক্ট ইকনমি" পাকিস্তান ডেভেলপমেন্ট রিভ্যু, ১৯৬৯ সাল ১ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

[২] সামাজিক কল্যাণের মাপকাঠিতে একটি দ্রব্যের মূল্যকে তার 'ছায়া মূল্য বলে।

[৩] এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত তথ্যাদি জেরার্ড সালিয়াঁদে-এর "দি পেজেন্টস অব নর্থ ভিয়েতনাম" নামক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত

[৪] লিও হাবারম্যান এবং পল এম্ সুহজীর *স্যোসালিজম ইন কিউবা* নামক গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।